Vol. 29 | No. 3 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা কবিতায় আধুনিকতা : ভারতচন্দ্র

Volume	29
Issue	3
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাইদুর রহমান ভূঁইয়া
Published online	June 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i3.2
Pages	58-90
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা কবিতায় আধুনিকতা : ভারতচন্দ্র

সাইদুর রহমান ভুঁইয়া

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে একটা গভীর, ব্যতিক্রমী ও সুদূর-প্রসারী তাৎপর্যে দৃষ্টিক্ষম নতুনত্ব নিয়ে বাংলা কাব্যে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব বিস্ময়কর হলেও আকস্মিক নয়। প্রতিকূল ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও সুদীর্ঘ মধ্যযুগের অবাধ ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুশীলনের ব্যাপক ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায়, ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই, বাংলা কাব্য মধ্যযুগীয় রীতি-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে একটা সুমহৎ সত্যবোধ ও শ্রেয়চেতনায় সুষম পরিণতি লাভ করে। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় কবিকৃতি তার সমস্ত আয়োজন ও ঐশ্বর্য নিয়ে একটা মহাযোগপর্বের সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর সেই মহাযোগ পর্বের প্রত্যাশিত ও যোগ্যতম কবি প্রতিভা। ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিক্ষম কাব্য-পারমিতায় বাংলা কাব্যের এ-সন্ধিক্ষণ একটা নতুন যুগের মহাসম্ভাবনার স্পষ্ট অভিজ্ঞতায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতচন্দ্রের, দুর্ভাগ্য বাংলা কাব্য তথা বাংলাদেশের জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির। ভারতচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, যার ফলে ভারতচন্দ্রের সম্ভাবনাময় মুক্ত কাব্যদৃষ্টি এবং বাংলাদেশের জাতীয় সাহিত্য মানবসত্যের মহিমা হারিয়ে এক সুদূরপ্রসারী কুটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁর "অন্নদা-মঙ্গল-কাব্য" রচনা শেষ করেন।[১] তার পাঁচ বৎসর পর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ হতে আগত ইংরেজ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা পর্যুদস্ত হয়। তার তিন বৎসর পর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র মৃত্যুবরণ করেন।[২] ফলে, দেশীয় শাসনাধীন বাংলা

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মনীষার স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাধীন ক্রমবিকাশ দ্বিতীয়বারের মত বিঘ্নিত হয়। একাদশ শতকে বাংলাদেশ আর্য-সেন রাজাদের অধিকারে এলে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা প্রথমবার ব্যাহত হয়; এবং আধুনিকতায় তার স্বাভাবিক উত্তরণের সমস্ত উপকরণ-উদ্যোগ বিনষ্ট হয়।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দিওয়ানী লাভ করে।[৩] সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূলে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর প্রশাসনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন বুঝতে পারল শাসক হিসেবে এদেশে টিকে থাকা যাবে, তখন আপন শাসনক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করা হলো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ—সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন ও শিক্ষা সংস্কৃতির প্রথম সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ সময় থেকে অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার বৎসর থেকে নতুন প্রশাসনিক শহর কলকাতায় আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতার অনুবর্তী ও অনুকূল সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম-কর্মের নতুন কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। তাই আধুনিক ইতিহাস রচয়িতা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দকে আধুনিকযুগের প্রারম্ভ বৎসর বলে চিহ্নিত করেছেন।

সমালোচকদের বিচারে আধুনিক যুগের কবি না হয়েও, একমাত্র কাঠামোগত সাদৃশ্য ব্যতীত ভারতচন্দ্রের কাব্যকলা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সর্বাংশেই আধুনিক লক্ষণযুক্ত ছিল।[৪] তবু ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের বিতর্কিত কবি—আধুনিকযুগের প্রাথমিক দিগ্‌দর্শী কবি নন। কারণ, তিনি পরাধীন আধুনিক যুগের কাব্যসাধক ছিলেন না।

মধ্যযুগের স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশের কালে বাংলা কাব্যের মহৎ গুণাবলীর যে ধারাটি ভারতচন্দ্রের প্রতিভায় নবযুগের সিংহদ্বারে উপনীত হয়েছিল, ইতিহাসের ক্রূরতায় এবং আধুনিক কাব্যসাধকদের বক্র দৃষ্টিতে সে ধারাটির অবাধ ও স্বতঃস্ফূর্ত উত্তরণ পরাধীন আধুনিকতায় কীভাবে একটা সঙ্কীর্ণখাতে প্রভাবিত হয়ে বাংলা কাব্য তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত ও খণ্ডিত করেছে,

সে ইতিহাস যেমন অবিমৃশ্যকারী তেমনি দুঃখজনক। তদুপরি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যসাধক ও ইতিহাসবেত্তা ইউরোপীয় রেনেসাঁর সমমানে বিচার করে এ-আধুনিকতার ধারণাকে কঠিনতর করে তুলেছেন।[৫] পরাধীন যুগের আধুনিকতার এরূপ জটিল প্রেক্ষিতে আধুনিকতা, ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং উনিশ শতকে বাংলাদেশের আধুনিকতার একটা সংক্ষিপ্ত অগ্রিম পরিচয়, মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্রের আধুনিক কবি-লক্ষণের প্রকৃতি ও আত্মস্বরূপ নিরূপণের সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

দুই

রেনেসাঁর সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু আধুনিকতা রেনেসাঁ নয়। বস্তুত রেনেসাঁ ও আধুনিকতায় পার্থক্য বিস্তর। আধুনিকতার ধারণা প্রাচীন,----মানুষের মতই প্রাচীন। আসলে, মানুষের মত আধুনিকতাও সময়ের সহচর; সময়ের গতিশীলতার সঙ্গে আধুনিকতাও গতিময়। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে মানুষই একমাত্র প্রাণী, যে সৃষ্টি হয়েও স্বয়ংসৃষ্ট। প্রকৃতিগতভাবেই সে এমন শক্তির অধিকারী, যে-শক্তিবলে সে তার প্রতিকূল সময় ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেকে অনবরত সংগঠিত করছে। সে শক্তি তার বুদ্ধি, তার উদ্ভাবনের ক্ষমতা, তার মননশীলতা ও বিশ্লেষণের দক্ষতা। সময়ের চলমানতার সঙ্গে এ-শক্তির বিবর্তনমূলক প্রকর্ষই আধুনিকতা। অর্থাৎ এ-শক্তির স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় জগৎ ও জীবনসম্পর্কিত ধ্যান, ধারণা, রীতি-নীতি ও বিধি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্ত যুগান্তকারী কোন যৌক্তিক সমন্বিত ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন বা উপকর্ষই আধুনিকতা। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পৃথিবীর যে-জাতি সময়ের চলমানতার সঙ্গে এই বিবর্তনমূলক অগ্রবর্তিতাকে স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তিতে আয়ত্ত করতে পেরেছে সে-জাতিই তার সমকালের আধুনিক জাতি। এতদর্থে, মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ মূলত আধুনিকতারই ক্রমবিকাশ। কিন্তু মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতা ও মননশীলতার প্রকর্ষ যতই সাধিত হোক, মানুষের অন্তর্নিহিত অহংবোধ এবং রক্ষণশীল স্বভাবধর্মের প্রভাবে জাতি ও সম্প্রদায়গত দেশকালের সীমায় আবদ্ধ, ধর্মীয় সংস্কার-সংস্কৃতির আদিম মানসিকতায় আচ্ছন্ন, মানবীয়

মহিমা ও শ্রেয়চেতনার সঙ্গে সম্পর্করহিত আত্মকেন্দ্রিক এ-আধুনিকতা তথা সভ্যতার আত্মস্বরূপ ও মনুষ্যত্বের মুক্তি ছিল অনন্বেষিত। উদাহরণস্বরূপ এশীয় ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী প্রাচীন সভ্য জাতিসমূহের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্তর্নিহিত অহংবোধ ও রক্ষণশীল প্রবণতার কারণেই অতীতের এসব অগ্রসর জাতিসমূহের মনীষায় এ-বিবর্তনমূলক শক্তির ক্রমপ্রসরণ এককভাবে নিরন্তর প্রবহমান থাকেনি। সাম্প্রতিক বিশ্বে এমন অনেক প্রাচীন জাতিই আছে যাদের এককালের প্রাগ্রসরতা সুবিদিত। অথচ সে-সব জাতি আজ রেনেসাঁসীয় আধুনিকতায় পশ্চাৎবর্তী জাতি হিসেবে পরিচিত। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এর একটিমাত্র কারণই প্রকট হয়ে ওঠে। পিতৃপুরুষদের প্রাচীন ধর্ম-সংস্কার-সংস্কৃতির প্রচলিত রীতি-নীতি, ক্রিয়াকর্মে এসব জাতির ছিল সুগভীর ও প্রচণ্ড আত্মাভিমানী বিশ্বাস। জগৎ, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে অদ্যম কৌতূহল এবং জ্ঞানের যৌক্তিক ও পারস্পরিক ধারণা সত্ত্বেও প্রবল অস্মিতাদোষে তাদের প্রজ্ঞার মুক্তি ছিল অবরুদ্ধ। তাদের কৃত নাটক, কাব্য-মহাকাব্য, ভাস্কর্য-শিল্প, গুহাচিত্র এবং জাতীয় বীরদের শৌর্য-বীর্য ও কৃতিত্ব বর্ণনায় এ-অহংসর্ব-মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের অমুক্ত প্রজ্ঞার প্রাগ্রসরতায় মানুষ নয়, দেবতা বা স্রষ্টাই ছিল সমস্ত শক্তির উৎস। যে কোন মূল্যে এমন কি জীবনের বিনিময়ে হলেও কল্পিত দেবতার মনস্তুষ্টিসাধনই ছিল মনুষ্যত্বের একমাত্র অভিজ্ঞান। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের অনুষঙ্গে মানবাত্মার স্বাধীন ও অমিতশক্তি, মহিমা এবং অভিন্নতা সম্পর্কে তারা সামান্যই পরিজ্ঞাত ছিল। তাই প্রাচীন বিশ্বের এসব প্রাগ্রসর জাতিসমূহের আধুনিকতা একালেও মানবত্ববিবর্জিত আত্মকেন্দ্রিক অবিমৃশ্যতায় খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ। অথচ মধ্যযুগে ইউরোপে রেনেসাঁ সংঘটিত হবার পর এ-আধুনিকতাই রেনেসাঁসীয় মহাজ্ঞান তথা মুক্তির স্পর্শে অন্তহীন সম্ভাবনায় এক নবতর চেতনায় উদ্দীপিত ও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। তবে সে আধুনিকতা রেনেসাঁসীয় আধুনিকতারূপে অভিহিত।

প্রায় তিনশত বৎসর ব্যাপী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নানা ঘটনা-পারম্পর্যের ব্যাপক অভিজ্ঞতায় রেনেসাঁ কি ভাবে সংঘটিত হয়েছিল এবং তার প্রকৃতি ও স্বরূপ কি ছিল, সে সম্পর্কে ইউরোপীয় মনীষীরা

বিস্তর গবেষণা করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে তার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বাংলাদেশের তথা-কথিত রেনেসাঁসীয় আধুনিকতা এবং মধ্যযুগীয় কবি ভারতচন্দ্রের কবিদৃষ্টির আধুনিক লক্ষণের প্রকৃতি ও স্বরূপ পর্যবেক্ষণে ইউরোপীয় রেনেসাঁর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই যথেষ্ট।

মধ্যযুগের ইউরোপে রেনেসাঁসীয় সমুত্থান ও বিবর্তনের মূলে ছিল ক্রুশেড—প্যালেস্টাইনের অধিকার নিয়ে আরবীয় মুসলমানদের সঙ্গে ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের ধর্মযুদ্ধ।[৬] সভ্যতা-সংস্কৃতির যে প্রাচীন ধারাটি কালপরিক্রমায় আবর্তিত হতে হতে খ্রীষ্টান ধর্ম আবির্ভাবের অব্য-বহিত পূর্বে গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় অব্যবস্থা ও সংঘাতে এবং খ্রীষ্টীয় নবধর্মের উগ্র, রক্ষণশীল নীতিমালা ও অনুশাসনের ফলে গ্রীক ও রোম সে ধারাটির সঙ্গে তাদের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলে। খ্রীষ্টীয় নবধর্মে দীক্ষিত সমগ্র ইউরোপ শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।[৭] খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ছয়শত বৎসর পরে ইসলামের নবধর্মে অনুপ্রাণিত আরব জাতি কর্তৃক সেই ধারাটি লালিত ও অনুশীলিত হয়ে সমৃদ্ধি লাভ করে। ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের প্রায় চারশত বৎসর পর সুদীর্ঘ তিনশত বৎসরব্যাপী[৮] আরবীয়দের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত মূঢ় ইউরোপীয় খ্রীষ্টানেরা মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির মানবীয় বৈভব সন্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও কৌতূহলী হয়ে ওঠে এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানক্রমে যুগপৎ ইসলামী জগৎ ও জীবনদর্শন এবং আরবী ভাষায় সংরক্ষিত ও অনুশীলিত গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ইউরোপীয়দের পরিচয় ঘটে।[৯] ক্রুশেডের শেষ পর্যায়ে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে আরবী ও ল্যাটিন ভাষা-অধ্যয়নের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতা সম্পর্কে ক্রমশ উৎসাহিত হয়ে ওঠে।[১০] খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে ইতালীয় কবি পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৫) গ্রীক ও রোমীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-চর্চায় উৎসাহিত করে ইউরোপবাসীদের প্রতি এক উদ্দীপ্ত আহবান জানান।[১১] ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীজাতি কর্তৃক কনস্তান্তিনোপল অধি-কারের ফলে সেখানকার গ্রীক জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিতেরা প্রথমে ইতালীতে এবং সেখান থেকে ক্রমশ সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।[১২] এ ভাবে

প্রাচীন বিশ্বের বিস্মৃতপ্রায় শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান-দর্শন, শিক্ষা-সংস্কৃতি চিন্তা-চেতনার মননশীল প্রজ্ঞায় ইতালীয় মনীষার প্রত্যাবর্তন সূচিত হয় এবং এ নবচেতনা ইতালী থেকে পর্যায়ক্রমে সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করে। এ-নবলব্ধ চেতনার উন্মুক্ত ও নির্মল বুদ্ধির বিবর্তিত পারমিতায় চতুর্দশ শতক থেকে ষোড়শ, কারো কারো মতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সমস্ত ইউরোপ শিল্পকলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্মাণশৈলীর এক অভূতপূর্ব, মহাসম্ভাবনাময় সৌন্দর্যে ও উৎকর্ষে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যে সার্বভৌম মহাসত্যের যাদুস্পর্শে এ অনন্ত সম্ভাবনার নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল, সেই পরম সত্যটিই ছিল গ্রীক ও রোমীয় জ্ঞানচর্চা থেকে উৎপন্ন অনন্য মহত্তম অবদান। সেই পরম সত্যটি হল স্বয়ং 'মানুষ',----ধর্ম নয়, দেবতা নয়, শাস্ত্র নয়, জাতি নয়, জাত্যাভিমান নয়;----'স্বয়ংপ্রভ মানুষ'। নিখিল বিশ্বে মানুষই হচ্ছে মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। আর মানুষ নামক সে সম্পদের সার হল তার বুদ্ধি, তার বিবেক, তার মননশীলতা, তার অনুভূতি, তার বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা--তার দৃষ্টিক্ষম ও পারঙ্গম প্রজ্ঞা ও যুক্তির সর্বত্রগামিতা। স্বীয় বুদ্ধি, বিবেচনা ও মননশীল অনুভূতির এ বিস্ময়কর দূরদর্শী ও বহুদর্শী ক্ষমতা আবিষ্কারের ফলই তার অতীত-বর্তমান, তার জগৎ-জীবন, সমগ্র মানব জাতি, তার পরিবেশ এবং সে নিজে এক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যে ও মাহাত্ম্যে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তির এ-অসামান্য সামর্থ্য ও মহত্ত্ববোধে ব্যক্তিসত্তা তথা মানবাত্মার চৈতন্যোদয়কেই ইউরোপীয় মনীষীরা রেনেসাঁ 'Renaissance' বলে অভিহিত করেছেন। জগৎ, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে পরমসত্য ও শ্রেষ্ঠত্ববোধে আত্মার এ-জাগরণ তথা মুক্তিই ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য, যার সারাৎসার ইউরোপীয় ভাষ্যকার যথার্থতই 'The discovery of the world and the discovery of man' বলে অবধারণ করেছেন।[১৩] এ-নব আবিষ্কৃত রেনেসাঁসীয় প্রজ্ঞানে বিশ্ব-জগতের অতি তুচ্ছতম প্রাণী বা বস্তু তার কাছে এক মহা-ইঙ্গিতময় অতি মূল্যবান সম্পদ; সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি তার অধ্যাত্ম ও অধিবিদ্যাবিষয়ক সাধনায় সিদ্ধিলাভের উদ্দীপক সামগ্রী, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ বিস্ময়কর রহস্যময়তায় ও অনন্ত

সম্ভাবনায় তার কাছে এক কৌতূহলোদ্দীপক পরম প্রিয় ধন। এ রেনেসাঁসীয় প্রজ্ঞানে চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক জগৎ, জীবন, মানুষ ও প্রকৃতির শাশ্বতিক শ্রেয়গুণ ও সৌন্দর্যস্বরূপের অন্বেষণে, দার্শনিক তার ঐহিক-পারত্রিক সম্পর্কের যৌক্তিক মূল্য বিচারে, বৈজ্ঞানিক তার বস্তুবিশ্বের মৌলিক উপাদান ও উপযোগগুণ বিশ্লেষণে তৎপর হয়ে ওঠে। এ ত্রিবিধ মনীষিতার সত্তাযুক্ত সত্যজ্ঞানে ও কল্যাণচেতনায় এবং মনুষ্যত্বের অখণ্ড মূল্যবোধের বিচারে পৃথিবীর ক্ষুদ্র-মহৎ প্রতিটি মানুষ তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, অতীত-বর্তমান এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একে অপরের পরিপূরক সহযোগী, ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী, অনন্য-নির্ভর সংবেদ্য-সুহৃদ এবং অনপেক্ষ মূল্যায়নে স্বীয় অস্তিত্বে মর্যাদার যোগ্য। উল্লেখ্য এ-রেনেসাঁসীয় প্রজ্ঞান মনীষী বা মনীষীদের একক কিংবা এককালীন সাধনায় প্রাপ্ত ফসল নয়। দীর্ঘ তিনশত বৎসর ব্যাপী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে মনীষীদের বহুমুখী সাধনায় উৎপন্ন সুফল এ রেনেসাঁসীয় জীবনদর্শন তথা মানবীয় মূল্যজ্ঞান।

স্মরণীয়, এই জীবন ও জগৎদর্শন শিল্পী-সাহিত্যিকের অনুধ্যানে প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং সাহিত্য-চিত্রকলার অনুশীলনেই এর প্রথম লক্ষণ উদ্ভাসিত হয়। বস্তুত সাহিত্য-শিল্পই ছিল এ-নব বিশ্বচেতনার প্রাথমিক, সার্বক্ষণিক এবং সর্বাত্মক প্রেরণার উৎস ও লালনক্ষেত্র। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রথাবদ্ধ ধ্রুপদ ও গতানুগতিক শিল্পরীতির সঙ্গে রেনেসাঁসীয় জীবনদর্শনের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিসমৃদ্ধ বিচিত্র ও ব্যাপক বিষয়-সম্পদ ও তার রূপগত কলা-কৌশল, সুতীব্র অনভূতির ব্যঞ্জনাত্মক বিন্যাস-শৈলী, বাক-রীতির বুদ্ধিদীপ্ত ও রসোত্তীর্ণ শিল্পিক দক্ষতা ইত্যাদির বহুবিধ নান্দনিক অনুশীলনে অভিযোজিত হয়ে সুকুমার শিল্পকলা অন্তহীন সম্ভাবনার অভিনবত্বে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে এবং রেনেসাঁ-অনুপ্রাণিত উন্মুক্ত ও ঋদ্ধ শিল্প-সাহিত্যের সর্বদর্শী মন্ত্রবলে বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-ধর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানব হিতৈষণার এক মহাকর্মযোগ সূচিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চিত্রশিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, আবিষ্কারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এ নবচেতনার সর্বতোমুখী বিশ্বজনীন কর্ম-

তৎপরতাই ছিল ইউরোপের রেনেসাঁসীয় আধুনিকতা।[১৪] সাম্প্রতিক বিশ্বের মানবীয় কল্যাণবোধ জগৎচেতনা, যুক্তি-বিচার ও মূল্যজ্ঞান এ রেনেসাঁসীয় প্রজ্ঞান ও কর্মযোগেরই মহান সুফল। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, উন্মেষ, বিস্তার এবং পরিণতিতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর কোন ধর্মীয় আধিপত্যবাদী, জাত্যাভিমানী কিংবা শ্রেণীগত অথবা সংস্কারাচ্ছন্ন ভূমিকা বা চরিত্র ছিল না। শিল্প-সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে বিশ্বজগৎ ও মানব-কল্যাণ সম্পর্কে সমস্ত সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে, সংস্কার ও ধর্মাভিমানমুক্ত অভিন্ন সত্য-সুন্দর ও কল্যাণবোধের প্রেরণা এবং তার সার্থক প্রতিফলনেই কোন জাতির জীবনে রেনেসাঁসীয় জাগরণের অভিজ্ঞান স্থাপিত।

তিন

ইউরোপীয় রেনেসাঁর উল্লিখিত মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উনিশ শতকের আধুনিকতাকে কোন বিচারেই রেনেসাঁধর্মী বা রেনেসাঁ-গুণযুক্ত বলা যেতে পারে না। এমন কি জাতীয় পর্যায়েও 'নব জাগরণ ' বা 'জাগৃতি' অভিধায় এর আখ্যায়ন অসঙ্গত। কারণ এ-আধুনিকতা কোন মনীষী কিংবা মনীষীবৃন্দের দীর্ঘদিনের আত্ম-নিষ্ঠ সাধনায় লব্ধ কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত চেতনায় উদ্ভাসিত কোন বাস্তব-জীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত ছিল না। অথবা কোন মানবিক শ্রেয়বোধ ও সার্বজনীন কল্যাণচেতনায়ও উদ্বুদ্ধ নয়। এমন কি বিজেতা শাসক-প্রভুদের নিজ দেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মুক্ত জীবনবোধের অনুসৃত ফসলও নয় এ আধুনিকতা ; আসলে উনিশ শতকে বাংলাদেশের আধুনিকতা ছিল অস্বাভাবিক ও জটিল। একই ভাষাভাষী একাধিক ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘকালের সোহার্দ্যমূলক সহাবস্থানের বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি দেশের পরধর্ম-অসহিষ্ণু আদিম মানসিকতায় পীড়িত, বিদ্বেষ-পরায়ন কোন একটি বর্ণ-শ্রেণীর স্বার্থের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট কতিপয় দেশীয় রাজা-ভূস্বামী দেওয়ান-বেনিয়া-কর্মচারীর নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রে সংস্থাপিত পরাধীন অবস্থা, উক্ত শ্রেণী-বিশেষের জীবনে নতুন সুযোগের সূচনা করতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তথা সমগ্র জাতির জীবনে তা বয়ে আনে এক চরম বিপর্যয়। উল্লিখিত সোহার্দ্যমূলক বৈশিষ্ট্যোস্থিত বাংলাদেশে উক্ত উপায়ে কথিত প্রকৃতির শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে স্থাপিত বিদেশী প্রভুত্বই ছিল উনিশ শতকের

তথাকথিত আধুনিকতার পটভূমি। স্বভাবতই, প্রথম থেকে এ আধুনিকতা পরিকল্পিতভাবে বৈদেশিক প্রভুর আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থের বিনিময়ে কথিত বর্ণ-শ্রেণীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে শ্রেণিক আধিপত্যের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সুনিয়ন্ত্রিত এবং বর্ণবাদী জাত্যাভিমানই ছিল এ-আধুনিকতার উদ্দীপক শক্তি।[১৫]

বিদেশী বণিকপ্রশাসনের প্রত্যক্ষ আনুকূল্য ও সহযোগিতায় কলকাতায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু কলেজ' ও ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠা ; উক্ত কলেজ দু'টোতে যথাক্রমে অন্ত্যজ ও অপর ধর্ম-শ্রেণীর এবং অব্রাহ্মণদের প্রবেশ নিবার্যতা[১৬] ; শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সহায়-সম্পদ, চাকরী-বাকরী ও বেনিয়া-মুৎসুদ্দী-বৃত্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উক্তবর্ণ-শ্রেণীর বিশেষ অনুগ্রহও অগ্রাধিকার প্রাপ্তি এবং সমকালীন পত্র-পত্রিকা, শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কৃতির প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে কথিত বর্ণশ্রেণীর প্রচণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তি ও গুরুত্ব উল্লিখিত সিদ্ধান্তের নিশ্চিত প্রমাণরূপে স্মর্তব্য। এভাবে বহুজাতিক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক অধিকার ও কর্তৃত্ব আত্মসাৎকারী উন্নসিত বর্ণ-শ্রেণীই উনিশ শতকের নবীন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর আধিপত্যবাদী আধুনিকতার রূপকার।[১৭] ইউরোপের রেনেসাঁসীয় মুক্তবুদ্ধি ও মানবিক মূল্যবোধে কিছু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনা পরিখ্যাত হলেও এ শতকের প্রবল ধর্মাভিমানী বাঙালী মনীষিতায় তার তাৎপর্যপূর্ণ মহিমা অনুধ্যান ও অবধারণ-যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। পরন্তু এ সময়ের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-চিন্তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় আর্য-সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থার সাহঙ্কার পুনরুজ্জীবনসাধন ও প্রভাব বিস্তার এবং প্রসঙ্গত ভিন্ন ধর্ম ও নিম্নবর্ণশ্রেণীর বিরুদ্ধে অবমাননা ও অবজ্ঞা প্রচার।[১৮] বস্তুত বাংলাদেশের উনিশ শতকের আধুনিকতা ছিল পুরাণী শ্রেণীর কৌলিন্যের অহংবোধে আবদ্ধ ও অবজ্ঞাপ্রবণ এবং এতদর্থে অমানবিক। আলোচ্য কালের কাব্য-উপন্যাস, সংবাদপত্র ও সমাজসংস্কারে উল্লিখিত আত্মাভিমানী ও উন্নাসিক মানসিকতায় এর প্রমাণ অনায়াস-লক্ষ্য।

উনিশ শতকে বাংলাদেশের আধুনিকতার উল্লিখিত স্বরূপের প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মর্তব্য যে, সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় অনুশাসন ও শাস্ত্রীয় বিধি-

ব্যবস্থার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আবদ্ধতা থেকে মানুষের মুক্তিই ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রাথমিক প্রয়াস এবং কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণী বিশেষের আত্মপরায়ণ আধিপত্যের লিপ্সা অথবা জাতি, ধর্ম বা শ্রেণী-বৈষম্যের মত হঠকারী ও অমানবিক কোন বিষয় ইউরোপীয় রেনেসাঁয় অবজ্ঞেয় ছিল। অর্থাৎ শ্রেণী বা গোষ্ঠীবিশেষের স্বার্থে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার কুক্ষিগত করার কৌশল উদ্ভাবন রেনেসাঁসীয় শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের চিন্তার বিষয় বা লক্ষ্য ছিল না। পক্ষান্তরে, দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অবস্থান, পরিবেশ ও স্বভাব-গুণের নিরিখে ন্যায় ও যুক্তির আলোকে, মমত্ববোধের সঙ্গে মানুষের মূল্যায়ন ও ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁর অন্যতম বিশিষ্ট অবদান। উনিশ শতকে বাংলাদেশের পরাধীন আধুনিকতা ছিল এই সংবেদনশীল বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও মানবত্বের পরিপন্থী। জ্ঞানপিপাসার প্রবল আগ্রহ ও অদম্য কৌতূহলে এবং আপন জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলার মহৎ উদ্দেশ্যে প্রাচীন জাতিসমূহের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যে ইতালীয় মনীষী পেত্রার্ক 'a revival of the study of antiquity'[১৯]-এর আহবান জানিয়েছিলেন---প্রাচীন ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও মহিমাকীর্তনের বাসনায় নয়। প্রাচীন বিশ্বে সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে ধর্মের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য এবং প্রাচীন জাতিসমূহের সভ্যতার ইতিহাস-অন্বেষণে তাদের ধর্মবিশ্বাস পর্যালোচনা একটি অতি আবশ্যক কর্তব্য। কিন্তু তার অর্থ সমাজজীবনে প্রাচীন ধর্মের পুনরুত্থান নয়। অথচ উনিশ শতকে বিদেশী প্রভুত্বের প্রভাবাধীনে প্রাচীন বর্ণ-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাঙালী মনীষার সংস্কার-সংস্কৃতিমূলক কিছু ধর্মাভিমানপ্রবণ শ্রেণীগত সাহিত্যসৃষ্টিকে আধুনিক ইতিহাসকার রেনেসাঁসীয় মানবতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং এরূপ সংস্কারসাধক ও সাহিত্যিককে মানবতন্ত্রবাদী অর্থাৎ Class Humanist বলে অভিহিত করেছেন।[২০] রেনেসাঁ সম্পর্কে বাঙালীর অমুক্ত মনীষার ভ্রান্ত ধারণাই এর কারণ বলে মনে হয়।

মুসলিম শাসনামলে সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী সম্মিলিত সাহিত্যসাধনার সুফল 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই বোধে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-অধ্যুষিত বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি ও সমঝোতার যে একক ও মহান বাঙালী জাতিত্বের ঐতিহ্য গড়ে

উঠেছিল, উনিশ শতকের উল্লিখিত-রূপ হঠকারী ও আত্মপরায়ন আধুনিকতা তার সমস্ত আয়োজন-উপযোগ সমূলে বিনাশ করে বাঙালী জাতিকে ধর্ম ও বর্ণের জালে আবদ্ধ এক হিংসিত জাতিভেদে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে,----রেনেসাঁসীয় বিমুক্ত চেতনায় ও আত্মোপলব্ধিতে যা একান্তভাবেই ছিল অবজ্ঞেয় ও অমানবিক।

চার

আধুনিকতা, ইউরোপের রেনেসাঁসীয় আধুনিকতা এবং বাংলাদেশের পরাধীন যুগের আধুনিকতার উল্লিখিত অভিজ্ঞার আলোকে ভারতচন্দ্রের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃতি ও স্বরূপলক্ষণ বিশ্লেষণ করার যৌক্তিকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অপহৃত হবার পর ভারতচন্দ্র বেঁচেছিলেন মাত্র তিন বৎসর এবং উক্ত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ পরাধীন যুগে ভারতচন্দ্র কিছু রচনা করেছন বলে মনে হয় না, তার কোন প্রমাণও নেই। অতএব পরাধীন যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতি বা অবস্থার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের কবিদৃষ্টির কোন যোগসূত্র ছিল না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের আসা-যাওয়া থাকলেও ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞতার অভাবে ইউরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতি বা রেনেসাঁ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করা ভারতচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর ইংরেজি ভাষায় অধিকার থাকলেও সমুদ্রচারী জলদস্যু প্রকৃতির পরাস্বাপহারী বণিকদের নিকট থেকে ইউরোপের রেনেসাঁসীয় আধুনিকতা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট জ্ঞান লাভের কথা কল্পনা করা যায় না। যুক্তিসঙ্গত কারণেই সমালোচকগণকর্তৃক স্বীকৃত ভারতচন্দ্রের আধুনিক লক্ষণ-সমূহের প্রকৃতি ও স্বরূপ বাংলাদেশের উনিশ শতকের আধুনিকতার অনুরূপ হতে পারে না। এমতাবস্থায় মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্রের কবিদৃষ্টির আধুনিক লক্ষণের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। তাই ভারতচন্দ্রের কাব্য ও জীবন-দৃষ্টির আধুনিক লক্ষণ নয়, প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণয়ই বক্ষ্যমান আলোচনার ঈপ্সিত লক্ষ্য।

ভারতচন্দ্রের প্রতিভার অসামান্যতা সম্পর্কে কেহই দ্বিমত পোষণ করেননি এবং তার প্রতিভার আধুনিক লক্ষণও স্বীকৃত।[২১] কিন্তু তাঁর

নির্মিতির প্রতিভা-তুল্য মান নিয়ে বিতর্ক আছে, ব্যর্থতার অভিযোগ আছে।[২২] দেশকালের অবস্থাগতিক এবং ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলী তাঁর কবিপ্রতিভার প্রকৃতি ও স্বরূপের কতটা সহায়ক ছিল—মনে হয়, সে সম্পর্কে একটা তুলনামূলক ও উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের অভাবই সম্ভবত উক্ত বির্তক, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অভিযোগের হেতু।

পাঁচ

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ,—উপমহাদেশের এক কঠিন দুঃসময়। সুদীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত, গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যিক বৈভব ও ঐশ্বর্যের মধ্যযুগ তার ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। মোগল বাদশাহী বংশধারার সর্বশেষ দোর্দণ্ড প্রতাপী সম্রাট আউরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭) সমর্থ উত্তরাধিকারের অভাবে উপমহাদেশের বিশাল মোগল সাম্রাজ্য তার সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য গৌরব হারিয়ে পতনোন্মুখ। পরাক্রান্ত বাদশাহী আধিপত্যের ক্ষয়িষ্ণু লক্ষণের স্পষ্ট আভাসে বহু-কালব্যপী পর্যুদস্ত বৈরী শক্তিসমূহ তখন উপমহাদেশের সর্বত্র শক্তি-সঞ্চয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে। সর্বত্র একটা ব্যাপক অরাজক বিশৃঙ্খলা, প্রত্যন্তে অবস্থিত বাংলাদেশের মাটি ও প্রকৃতিতে দিল্লীর শাসনব্যবস্থা কোন কালেই স্থায়ী হতে পারেনি, সপ্তদশ শতকের শুরুতে মোগল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতির সার্বিক লক্ষণ-দৃষ্টে বরাবর স্বাধীনতা প্রিয় বাংলাদেশ উপমহাদেশের এ যুগান্ত ক্রান্তিকালে সর্বকালের জটিল দুঃসহ সঙ্কটের এক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী আবর্তে বিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত।[২৩] দিল্লীর বাদশাহী আধিপত্য থেকে প্রায় মুক্ত, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ-পুরুষদের ষড়যন্ত্রে ব্যতিব্যস্ত, হামার্দ-বর্গী দস্যুদের অত্যাচার-লুণ্ঠন ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কুঠিয়ালদের অনধিকার কার্যকলাপ ও ঔদ্ধত্য প্রশমনে স্বাধিকারপ্রিয় বাংলার বৃদ্ধ নবাব শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন; রাজ-কোষাগার প্রায় শূন্য। অর্থবল, সৈন্যবল ও মনোবলে নিঃস্বপ্রায় স্বাধীন নবাবের সহায়-সম্বলহীনতার সুযোগে দেশের আশ্রিত রাজা-ভূস্বামীরা তখন নিজ নিজ অধিকারে প্রায় স্বাধীন এবং স্বীয় অধিকার ও প্রতিপত্তি সুদৃঢ় করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত; সম্পত্তিশালী সকলেই আপন স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত। প্রশাসনিক আইন-শৃঙ্খলা, নিয়মনীতি বিপর্যস্ত। রাজ-কর্মচারীরা ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধির ফিকিরে তৎপর। সমগ্র দেশ

মাৎস্যন্যায়ের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। হার্মাদ-বর্গী দস্যুদের অত্যাচার-লুণ্ঠনে, রাজা-ভূস্বামীদের বর্ধিতহারে কর আরোপ এবং রাজ-কর্মচারীদের স্বার্থান্বেষী উৎপাতে দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি বিধ্বস্ত। প্রজা-সাধারণ অসহায়, নিঃস্ব, বিচারবিমুখ এবং নিরাপত্তার অভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত। একটা ব্যাপক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে, শঙ্কা-সংশয়ে সমগ্র জাতি বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত।[২৪] এ সময়ে বাংলাদেশের বেগতিক অবস্থা সম্পর্কে ভারত চন্দ্রের একটি পরোক্ষ উক্তি স্মরণযোগ্য।:

উত্তম অধম না হয় নিয়ম
কেহ নাহি ধর্ম-লেশের।
দাতা ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা
চোর ফিরে সাধু বেশেরে ॥[২৫]

উক্তিটি বাংলাদেশের সমকালের চরম অব্যবস্থা-বিশৃঙ্খলার প্রতি কটাক্ষ করেই যে উক্ত হয়েছে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ সময়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একশ্রেণীর বখাটে, সমাজচ্যুত ভবঘুরে, ফটকা ব্যবসায়ী, সুযোগসন্ধানী বণিক-মহাজন এবং উচ্চবিত্তের উচ্চাভিলাষী উচ্চবর্ণ শ্রেণী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়ালদের প্রশ্রয়ে ও সাহায্য-সহযোগিতায় অননুমোদিত ব্যবসায়িক লেন-দেনের নগদ অর্থবলে সহসাই এতটা শক্তি শালী হয়ে ওঠে যে মধ্যযুগীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উচ্চ-নীচ, উত্তম-অধম, ভাল-মন্দ একাকার হয়ে যায় এবং সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থায় একটা চরম বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। এ-অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে মধ্যযুগের মুসলিম শাসনের মানবীয় স্বাভাবিকতায় এতকালের অবদমিত বর্ণবাদী ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পুনরায় সমাজজীবনে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে।[২৬] সপারিষদ নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ছিলেন তার প্রধান উপকৃত্তা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্যপুষ্ট, নবাবের শাসনের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ এই নবীন ধনিক-বণিক ও উচ্চ বর্ণ-শ্রেণীর রাজ-ভূস্বামীর পরোক্ষ সমর্থনেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কুঠিয়ালরা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে তাদের অবস্থান ক্রমশ এমন সুদৃঢ় করে তোলে যে, দেশের সার্বভৌম অধিকারেও হস্তক্ষেপ করতে দুঃসাহসী হয়ে ওঠে।[২৭] এরও পরোক্ষ মন্ত্রণাদাতা ছিলেন অভিজাত বর্ণ-সমাজের উৎসাহক নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।[২৮]

অষ্টাদশ শতকের সমগ্র প্রথমার্ধব্যাপী বাংলাদেশের উল্লিখিত চরম আপৎকালের প্রাক্‌মুহূর্তে এই শতকের প্রথম দশকে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী পরিবারে ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্ম থেকে ক্রম-অবনতিশীল সঙ্কটের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অবলুপ্তি (১৭৫৭) পর্যন্ত ভারতচন্দ্র তাঁর জীবনকাল অতিবাহিত করে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন বাংলাদেশের দুঃসহতম বিপত্তিকালের কবি এবং তাঁর ব্যক্তিজীবনও আপৎমুক্ত ছিল না। বাল্যকাল থেকেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাধীনচেতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বাস্তবদৃষ্টিক্ষম এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন ভারতচন্দ্র রায়। দশ বৎসর বয়সে বর্ধমানরাজের নিগ্রহে বিপন্ন পরিবার থেকে পালিয়ে মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষালাভ, চৌদ্দ বৎসর বয়সে শিক্ষা সমাপনান্তে অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ-পূর্বক পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন এবং অভিভাবকগণকর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে পুনরায় ফার্সী ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ, তদনন্তর অভিভাবকগণকর্তৃক পারিবারিক বিষয়-সম্পত্তির মোক্তাররূপে বর্ধমান রাজদরবারে নিযুক্তি, জমি-জমার কর-সংক্রান্ত জটিলতায় বর্ধম্যান রাজের সঙ্গে বিরোধহেতু কারাবাস এবং বুদ্ধিবলে প্রভাবিত কারাধ্যক্ষের সহায়তায় বন্দীদশা হতে মুক্তি ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে প্রায় চার বৎসর অজ্ঞাতবাস,[২৯]---ইত্যাদি ঘটনাবলী ভারতচন্দ্রের উল্লিখিত মুক্ত, স্বাধীন ও প্রাতিস্বিক আত্ম-স্বরূপেরই পরিচয় বহন করে। কিন্তু জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণে, জ্ঞাতি-বর্গের উপরোধে, বর্ধমান রাজের অনবচ্ছিন্ন বিদ্বেষের মুখে সংসার-জীবনে প্রত্যাগত, স্বাধীনচেতা নিরূপায় ভারতচন্দ্রকে নিরাপত্তার প্রয়োজনে শেষ পর্যন্ত বেতনভুক আশ্রিত কবি হিসেবে উচ্চবর্ণের শীর্ষস্থানীয় সমাজপতিবেষ্টিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। স্বাধিকারপ্রিয়, সত্তানিষ্ঠ ভারতচন্দ্রের জন্য সে আর এক দুঃসহ শ্বাসরুদ্ধকর আবদ্ধাবস্থা। মধ্যমণিরূপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং এবং তার সভাসদবর্গের সকলেই ছিলেন ভোগমত্ত মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল, বিকৃতরুচির স্থূল রস-রসিকতায় আমোদপ্রিয়, কামকেলি বিলাসী, যৌনাচারভ্রষ্ট, বিকারগ্রস্থ লম্পট ও দুশ্চরিত্র। এরূপ নীতিবোধ-বিবর্জিত, দেশ-জাতি, সমাজ-ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, আচার-ভ্রষ্ট

কামোন্মত্ত পূতিগন্ধময় রাজসভার সভাকবি ছিলেন ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর।[৩০] রায়গুণাকরের কবিপ্রতিভার প্রকৃতি ও স্বরূপ অন্বেষণে তাঁর স্বদেশিক ঐতিহ্য গৌরবসচেতন কবিমানসের ওপর ইতিহাস-কালের উল্লিখিত বিষম উপদ্রব এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কাণ্ড-জ্ঞানহীন, যথেচ্ছাচারী নারকীয় পরিবেশের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অবশ্যই বিবেচ্য।

ছয়

রাজপোষকতায় কাব্যানুশীলন মধ্যযুগের স্বীকৃত রীতি। কিন্তু ভারত-চন্দ্রের কবিব্যক্তিত্ব ও প্রকৃতি মধ্যযুগীয় ধাঁচের ছিল না। মধ্য-যুগের কবি হলেও, পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, ভারতচন্দ্র ছিলেন এক মহাসম্ভাবনাময় নবজাগৃতির প্রতিশ্রুত প্রথম কবিপ্রতিভা। তাই মধ্যযুগের রাজপোষকতা ভারতচন্দ্রের জন্য প্রীতিকর ছিল না। শৈশব-কাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিকূল অবস্থার পীড়নে ও ব্যক্তিত্বের সংঘাতে পোড়খাওয়া, স্বাধীনচেতা ও তেজঃস্বীন কবিপুরুষ ভারতচন্দ্রের জন্য এ পারবশ্যতা খুবই অবমাননাকর ও যন্ত্রণাদায়ক ছিল। স্মর্তব্য যে, বিশেষ উদ্দেশ্যে অন্নদা-মঙ্গল-কাব্য রচনার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্তৃক ভারতচন্দ্র আদিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এমন একটি গতানুগতিক প্রথাবদ্ধ, অনাদৃত ও ক্ষয়িষ্ণু মহিমার দেব-প্রশস্তির কাব্য-রচনা সত্তানিষ্ঠ ও বাস্তববাদী কবি ভারতচন্দ্রের জন্য স্বভাবতই আনন্দ-দায়ক ছিল না। তদুপরি, বিচক্ষণ ভারতচন্দ্র বুঝেছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে দেবপ্রশস্তির জন্য বলা হলেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশগৌরব প্রচারই কথিত আদেশের অন্তঃপাতী উদ্দেশ্য। কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের প্রথাবদ্ধতাবিরোধী বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যয়ে দৃঢ়সঙ্ক ভারতচন্দ্রের স্বাধীনচেতা কবিব্যক্তিত্বের পরছন্দানুবর্তী যাতনার উৎ-সাহব্যঞ্জক সহায়ক কারিকাশক্তি ছিল তাঁর বাকচাতুর্য, শব্দের প্রযৌক্তিক প্রয়োগকৌশল, তাঁর বুদ্ধিপ্রখর সাহসিক কবিদৃষ্টি।

বস্তুত বাগবৈগধ্য ছিল ভারতচন্দ্রের প্রতিভার অন্যতম প্রধান কাব্যনির্মাণ কৌশল—তাঁর কাব্য-কলার জাদুকরী শক্তি, তাঁর কবি-কৃতীর সোনার-কাঠি। ছন্দ ও বাক্-রীতির গতানুগতিক মধ্যযুগীয়

প্রথাবদ্ধতা থেকে বাংলা কাব্যের মুক্তি অনুধ্যানে ভারতচন্দ্রের ঐন্দ্রজালিক বাক্-চাতুর্য ও ছন্দ-বৈচিত্র্যের মৌলিক উপাদান ছিল শব্দ, তৎসম, তদ্ভব ও দেশী-বিদেশী শব্দ। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রই প্রথম আধুনিক দৃষ্টিক্ষম কবিব্যক্তিত্ব, যিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সে ভাষাই সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী, প্রকাশক্ষম মাহাত্ম্যে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত, যে ভাষা অপর ভাষার শব্দরাজি সহজেই আত্মসাৎ করে আপন শব্দ-ভাণ্ডারকে প্রাচুর্যের প্রগলভতায় গৌরবিত করে তুলতে পারে। তাই তিনি কৌশলে সপারিষদ কৃষ্ণচন্দ্রকে রসাসিক্ত কাব্য-সৃষ্টির কৈফিয়ত দিয়ে দেশী-বিদেশী শব্দ সহযোগে বাংলা ভাষা যে কত সহজেই প্রকাশ-মাহাত্ম্যের সৌন্দর্যে ও বৈচিত্র্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে,---ভবিষ্যৎ কবি-সাহিত্যিকের জন্য তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন অন্নদা-মঙ্গল-কাব্যে। ব্যঞ্জনাত্মক ভাব-প্রকাশে, মাধুর্যমণ্ডিত ছন্দদোলায় এবং সর্বাপরি কাব্যশিল্পের উৎকর্ষ-সাধনে শব্দের যে এক মহাসম্ভাবনাময় বিস্ময়কর শক্তি আছে ভারত চন্দ্রই তার প্রথম উদ্ভাসক কবি-প্রতিভা। অর্থাৎ শব্দই যে কবিতার প্রাণ, কবিতার সৌন্দর্য, মাধুর্য, কবিতার সাহঙ্কার গৌরব--শব্দের বিচিত্র ও ব্যাপক ব্যঞ্জনাত্মক প্রয়োগ সূক্ষ্মতায় যে কাব্যশিল্পের নান্দনিক মাহাত্ম্য নিহিত---আধুনিক কাব্য-সংবিত্তির এ সত্য বাঙালী মনীষার রেনেসাঁসীয় অভিজ্ঞতার বহু পূর্বেই ভারতচন্দ্রের কাব্যানুশীলনে বীক্ষিত হয়েছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভামণ্ডপে প্রথাবদ্ধরচনার বিরক্তিকর স্ফূর্তিহীনতায় ভারতচন্দ্রের কবি-ভাষার এই জাদুকরী ক্ষমতাই ছিল তাঁর একমাত্র আশীর্বাদ—তাঁর সান্ত্বনা ও আনন্দ-উপাচার। তাঁর ভাষা ভঙ্গির ইন্দ্রজালে কেবল ঈশ্বরী পাটুনী একাই বিমূঢ় হয়নি, সপারিষদ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও বিভ্রান্ত হয়েছেন। ভারতচন্দ্রের উপর আদেশ ছিল, অনার্য-দেবী মঙ্গল-চণ্ডীর নতুনরূপ—উচ্চবর্ণের অভিজাত বৈশিষ্ট্যে, অন্নদারূপে দেবীর মাহাত্ম্য-সঙ্গীত রচনার। কিন্তু একমাত্র 'অন্নদা-মঙ্গল'—এ অভিজাত শিরোনামাটুকু ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র, অভিনব আভিজাত্যিক মাহাত্ম্যে দেবীর মঙ্গলগান কীর্তিত হয়নি। বরং সমগ্র অন্নদা-মঙ্গল-কাব্যে দেব-মাহাত্ম্যের নামে ভারতচন্দ্রের বাগবৈদগ্ধ্য এবং কবিব্যক্তিত্বের বস্তুনিষ্ঠ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্লবাত্মক নতুন পরিচয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সমকালের বৈর অবস্থা ও অবস্থানের পীড়নে পর্যুদস্ত, ক্লিষ্ট ভারতচন্দ্রের কবিদৃষ্টিকে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ শ্লেষ ও ব্যাজস্তুতিবাচক ইত্যাদি শব্দালঙ্কারের বক্রতায় দুর্বিনীত করে তোলে বলে মনে হয়। তার এ-অপ্রসন্ন মানসিকতার প্রথম অভিগ্রস্থ দেবতা শিব। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর ভ্রষ্ট রুচি ও নষ্ট মন-মানসিকতার সুযোগে অশোভন রস-রসিকতা ও স্থূল হাস্য-কৌতুক এবং বাচনভঙ্গির স্বভাবসিদ্ধ কৌশলে ভারতচন্দ্র ঐতিহ্যিক অনার্য দেবতা শিবকে নিলাজ ক্ষ্যাপাটে, শালীনতাবোধবর্জিত এক গ্রাম্য সাধারণ আমুদে চরিত্রে পরিণত করেছেন। মনে হয়, মধ্যযুগের দেব-মাহাত্ম্যে ক্লান্ত শ্রোতাদের সহজ ও স্থূল আমোদপ্রদানই যেন শিবচরিত্র অবতারণার মুখ্য উদ্দেশ্য। শিব যেন গ্রাম্য পূজা-পার্বন-উৎসবের এক ধর্মীয় বিদূষক। অন্নদামঙ্গলের কেন্দ্রীয় চরিত্র অন্নদা-মাহাত্ম্যের অসারত্ব প্রতিপাদনে ভারতচন্দ্র অবশ্য কিছুটা পরোক্ষ ও সূক্ষ্ম-কৌশল অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের কৌশলে প্রশস্তির নামে প্রকারান্তরে, কখনো বা প্রত্যক্ষ উক্তিতে অন্নদামহিমার চূড়ান্ত হেনস্থা করেছেন ভারতচন্দ্র। পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি হয়েও সামান্য অজুহাতে ছলনা করে হরি-হোড়ের গৃহত্যাগ, বিনাদোষে মানসিংহের সেনা-ছাউনিতে ঝড়-বৃষ্টির অবতারণার বিবেকহীন ক্রূরতা, দিল্লীতে ভূতের উৎপাতে সামান্য গ্রাম্য মহিলার মত প্রতিহিংসাপরায়ণ, স্থূল ও অলীক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, বসন্ত উৎসবে আনন্দমগ্ন দেবকুমার নলকুবরের অসর্তক উক্তির জন্য অশিষ্ট ক্রোধ প্রকাশ ও শাস্তি প্রদানের অবিমৃশ্যকারী অভিসন্ধি--- ইত্যাদি ঘটনা, সমস্ত সৃষ্টির উৎসরূপী আদ্যাশক্তির জন্য অবশ্যই অমর্যাদাকর ও নিন্দাযোগ্য, এবং অদেব-সুলভ। মনে হয়, ছলনায়-প্রবঞ্চনায় ও ক্রূরতায় দেবী যেন এক মূর্তিমতী নির্বিকার পাষণ্ড-স্বরূপ, যেন প্রবঞ্চনা, অত্যাচারই তার স্বভাব এবং পেশা। দেবীর এ সব অমহৎ কার্যাবলী কৌশলী ভারতচন্দ্রের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা খুব কঠিন ছিল না। পরন্তু, স্বর্গলোকে দেবী অন্নদার পূজা প্রসঙ্গে অন্নদা সম্পর্কে উপ-দেবকুমার নলকুবেরের উক্তি, লক্ষণীয় :

এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা ॥

... ...

অন্নদা যেমন কতেক তেমন
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে ॥ —[৩১]

এ-উক্তি সবিশেষ অভিনিবেশযোগ্য। এরূপ অবজ্ঞাত উক্তির পর অন্নদার দেব-মর্যাদার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। এমন কি একটি সাধারণ ভোগ্যা নারীর মর্যাদায়ও তিনি বাঞ্ছিতা নন। অতঃপর দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের প্রতি ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধ মনোভাব সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

সাত

ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, শ্লেষ, ব্যাজস্তুতি ইত্যাদি শব্দালঙ্কার, বিশেষ করে শ্লেষ, ব্যাজস্তুতি ব্যবহার ছিল ভারতচন্দ্রের অতিপ্রিয় বাচনকৌশল। এ-সবের প্রয়োগে তাঁর দক্ষতা ছিল তর্কাতীত। ভারতচন্দ্র তাঁর এ কৌশল কেবল কাব্যের শিল্প-রীতিতে প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হননি। উক্ত কৌশলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আরাধ্য দেবী অন্নদার দুর্গতির শেষ করেও সম্ভবত ভারতচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন যাতনা প্রশমিত হয়নি। সমগ্র অন্নদা-মঙ্গলের অবকাঠামোও ভারতচন্দ্র শ্লেষ-ব্যাজস্তুতির কৌশলেই পরিকল্পনা করেছেন বলে ধারণা হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের চরিত্র পরিকল্পনা তারই সাক্ষ্য বহন করে।

বেতনভুক আশ্রিত কবি ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। প্রবল আত্মসচেতন, স্বাধীনচেতা ভারতচন্দ্রের কবিব্যক্তিত্বের পক্ষে এ-অপ্রসন্নতা অস্বাভাবিক ছিল না। দেব-প্রভাবিত, শাস্ত্রানুমোদিত ও প্রথাবদ্ধ সামাজিক জীবনব্যবস্থার প্রতিই কেবল নয়, সমকালের আর্থ-সামাজিক-প্রশাসনিক কাঠামোর সামন্ত-ভূস্বামীদের প্রভুশক্তির প্রতিও ভারতচন্দ্র বিক্ষুব্ধ ছিলেন। কারণ, এসব নীতিজ্ঞানহীন, পরস্বাপহারী ধর্ম-ধ্বজীদের অত্যাচার-অনাচারে নির্যাতিত স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই একদিন অতি শৈশবে অস্তিত্বরক্ষার তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল। তারপর থেকে ভারতচন্দ্র এদের নীতিহীন যথেচ্ছাচারে আজীবন তাড়িত হয়েছেন, আর তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছেন। কেবল বর্ধমান রাজ-পরিবার দ্বারাই নয়, ভূস্বামী পরিবারের সন্তান ভারতচন্দ্র আপন ভূস্বামী ভ্রাতাদের

প্রতিও প্রসন্ন ছিলেন না। বর্ধমান রাজ-কারাগার থেকে পালাবার পর আমৃত্যু ভারতচন্দ্র আর পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নি; স্ত্রীকেও সেখানে যেতে দেননি।[৩২] মনে হয়, বর্ধমান রাজকর্তৃক কারারুদ্ধ হওয়ার পশ্চাতে ভ্রাতাদের কূট-কৌশল ছিল বলে ভারতচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। তাঁর আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও মূলাজোরের ইজারা নিয়ে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেননি। মূলাজোর গ্রাম স্বেচ্ছায় ভারতচন্দ্রকে ইজারা দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভে উক্ত গ্রাম পুনরায় ভারতচন্দ্রের আজন্মের বৈরী বর্ধমান রাজ-পরিবারকে ইজারা দিয়েছিলেন,---যার ফলে ভারচন্দ্রের জীবনে আবার নতুন করে উৎপাত শুরু হয়েছিল। এবং নাগাষ্টকের মত একটি ছোট কাব্যের মাধ্যমে কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে তাঁর বেদনা নিবেদন করতে হয়েছিল।[৩৩] কেবল নিজের জীবনই নয়, এদের স্বার্থান্ধ বিচারহীনতায় আরো অনেক পরিবারের করুণ পরিণতি দেখেছেন ভারতচন্দ্র। অষ্টাদশ শতকের এসব লোলুপ, উৎপীড়ক সামন্ত ভূস্বামীর ওপর ভারতচন্দ্রের মত একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বাস্তব-বাদী, মানবধর্মী কবি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না এবং তিনি সন্তুষ্ট ছিলেনও না----আশ্রয়দাতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ওপরও নয়।

ধারণা করা হয়ে থাকে, বর্ধমান রাজ-পরিবারকে কলঙ্কিত করার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছায় ভারতচন্দ্র তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর নায়িকা বিদ্যাকে বর্ধমান-রাজকন্যার পরিচয়ে উপস্থাপন করেছেন।[৩৪] ভারতচন্দ্রের মত একজন কৌশলী ও তেজস্বী কবিব্যক্তিত্বের পক্ষে তা' অমূলক বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমালোচকদের মতে অন্নদা-মঙ্গল-কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ 'বিদ্যা-সুন্দর' উপ-কাহিনী। এ অভিমত সম্ভবত, বিদ্যাসুন্দরের ভাষা, ছন্দ ও রস-বৈচিত্র্যের বিবেচনায়। কিন্তু ভারত-চন্দ্রের সর্বাত্মক কবিগুণ বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায়,---বিশেষ করে কবি দৃষ্টি ও কাব্যকৌশল, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিতা, দেশকাল-সমাজ-চেতনা ও ধর্মবোধ ইত্যাদি আরো বহু বিষয়ে তাঁর যথার্থ কবিস্বরূপের পরিচয়সমৃদ্ধ কাব্যাংশ 'মানসিংহ-ভবানন্দ' উপাখ্যান। তাঁর উৎকৃষ্টতম কবিতা 'অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা' এ-কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। অন্নদা-মঙ্গল-কাব্যের আসল উদ্দেশ্য বিবেচনায়ও 'মানসিংহ-ভবানন্দ' উপা-খ্যানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। 'বিদ্যসুন্দর' কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশ্য-সফল কাব্য নয়, এ-কাব্যের আরাধ্য দেবীও অন্নদা নয়। তবে শৃঙ্গর রসের

প্রতি সপারিষদ কৃষ্ণচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যের সুযোগে ভারতচন্দ্র বিদ্যা-সুন্দরে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করে থাকতে পারেন। কিন্তু দেশকাল-সমাজজীবন, দেবপ্রশস্তি এবং কবি ভারতচন্দ্র ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র---উভয়ের উদ্দেশ্য সাফল্য-অসাফ্যল্যের বিচারে মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান কেবল গুরুত্বপূর্ণই নয়, কৌতূহলোদ্দীপকও। মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যানে ভবানন্দ মজুমদারের বিসদৃশ চরিত্র পরিকল্পনার কৌশলদৃষ্টে মনে হয়, দেবানুগ্রহের সুযোগে পরোক্ষভাবে অতি সতর্কতার সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং তাঁর রাজবংশের ওপর ভারতচন্দ্র আরো তীব্র ঘৃণা ও কলঙ্ক লেপন করেছেন।

মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র তথা নায়কচরিত্র ভবানন্দ মজুমদার---বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রায় স্বাধীন নবাবী আমলে বাংলাদেশে সামন্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার,---অন্নদার পূজা প্রচারার্থে স্বর্গলোকের অভিশপ্ত উপ-দেব-কুমার, নরলোকে মানবসন্তান ভবানন্দ মজুমদার,----অন্নদার ভক্ত-সেবক, হুগলীতে মোগল শাহী, রাজস্ব-বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত কানুনগো, পরে বাংলাদেশের শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর অঞ্চলের সামন্ত ভূস্বামী ভবানন্দ মজুমদার। মধ্যযুগের দেবপ্রভাবিত সমাজ-ধর্মব্যবস্থার এবং মোগল প্রশাসনিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বাংলাদেশের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কিন্তু মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যানের অতি গুরুত্বপূর্ণ নায়করূপে সে বিস্ময়করভাবেই বড় বেশী অনুজ্জ্বল, প্রাণহীন, সমগ্র উপাখ্যানের একমাত্র অবজ্ঞাত চরিত্র। ভাল-মন্দ-ন্যায়-অন্যায়বোধে, সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে, আনন্দ-বিষাদে, বিপদে-আপদে এত বেশী নির্বিকার, এত নিষ্ক্রিয় ও নির্জীব যে সমগ্র উপাখ্যানের এত ঘটনার মধ্যেও তার অস্তিত্ব একান্তভাবেই গৌণ,---প্রায় অননুভবনীয়। অথচ ভারতচন্দ্রের এ-ভবানন্দই স্বর্গলোকের দেবকুমার নলকুবেরের রূপে মত্ত অবস্থাতেও প্রকৃতি-চেতনায়, বস্তুনিষ্ঠ মূল্যবোধে ও যুক্তিবিচারে এবং সত্তানিষ্ঠ স্বাধীন মনোভাবে মাত্র দুটি কবিতার কয়েকটি চরণে অত্যন্ত সজীব ও উজ্জ্বল। কেবল স্বর্গলোকের নলকুবেরই নয়, মানসিংহ-ভবানন্দ-উপাখ্যানের দেবতার সঙ্গে সম্পর্করহিত কিম্বা দেবতাবিমুখ, অতি ক্ষুদ্র অথবা মহৎ প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক পার্শ্ব চরিত্রগুলো তার বাস্তব-দৃষ্টির ত্বরিত স্পর্শে অতি সহজেই স্বীয় বৈশিষ্ট্যে অন্ধকার আকাশের

নক্ষত্রের মতই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। উল্লেখ্য, অন্নদাকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সন্তানের অব্যাহত কল্যাণকামনায় ঘড়ায় ঘড়ায় মোহরের পরিবর্তে কৌতূহলী, নির্লোভ ও বিমূঢ় ঈশ্বরী পাটুনীর মানবিক আবেদন ; আত্ম-মর্যাদা ও স্বাধীনতার মহিমায় উদ্দীপিত, দেবতাবিমুখ প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতার জন্য বীরত্বব্যঞ্জক মহান আত্মোৎসর্গ, দিল্লীতে ভবানন্দের অনুচর-রূপে আগত বিড়ম্বিত দাসু-বাসুর জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তি ও দেশানুরাগ, পদ্মিনী-চন্দ্রিনীর দাসী সাধী-মাধীর নিজ নিজ কর্ত্রীর মর্যাদা রক্ষায়, অনুগত পরিচারিকাসুলভ ব্যাকুলতা ইত্যাদি স্বল্প পরি-সরের প্রসঙ্গ কথা হলেও, জগৎ, জীবন ও মানব-চরিত্র সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বস্তুনিষ্ঠ সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও মূল্যজ্ঞানে সন্দেহ প্রকাশ করার অবকাশ নেই। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট হলেও বিদ্যা ও সুন্দরের আসঙ্গলিপ্সায় নর-নারীর অনাদি-কালের প্রণয়াবেগের অতি ঘনিষ্ঠ স্বরূপের স্বাভাবিক ও অনিবার্য অতি বাস্তব তথ্যের রসঘন কাব্যস্বরূপ তথা কাব্যমূল্য অনস্বীকার্য। বস্তুত, ভারতচন্দ্রের কবি-ব্যক্তিত্বের স্বভাব ছিল, অতি সূক্ষ্ম বাস্তবদৃষ্টিতে যে কোন মানবসম্পর্ক বা বিষয়ের গভীরে তার প্রকৃত রূপটির যথার্থ স্বরূপ বা মূল্য নিরীক্ষণ। অন্নদা-মঙ্গলে শিবপ্রশস্তি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র অথবা মহৎ যে কোন উপস্থাপনায় ভারত-প্রতিভার উল্লিখিত স্বভাবধর্মটি লক্ষযোগ্য। তাই ইতিহাসের বিশ্রুতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যানের নায়ক চরিত্র সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের উদাসীনতা একটা গূঢ় রহস্যময়তার সংশয়ে পাঠকচিত্তকে কৌতূহলী করে তোলে। মনে হয়, ভবানন্দ মজুমদারের চরিত্রসৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র উদাসীন ছিলেন না, ব্যর্থও নন। বরং অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গেই তিনি ভবানন্দের চরিত্র পরিকল্পনা করেছেন। ভবানন্দ একদিকে অন্নদার ভক্ত সেবক, অপরদিকে সামন্ত ভূস্বামী,---ভারতচন্দ্রের বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গিতে মধ্যযুগের এ জাতীয় দেবভক্ত ভূস্বামীর চরিত্র যা পাওয়া বাঞ্ছণীয়, ভবানন্দের চরিত্র সে ভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে বলে ধারণা হয়। বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য, ভবানন্দের দেব-মুখাপেক্ষী নিষ্ক্রিয়, নিষ্প্রাণ, ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র-সত্তায়ও একটা প্রচ্ছন্ন লোলুপ, স্বার্থপর, ও সুযোগসন্ধানী অভিলাষ চাপা ছিল। স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ-জাতীয় চরিত্রের অসাধ্য কিছুই নেই,---মধ্যযুগের অন্তিমলগ্নে সামন্ত ভূ-স্বামীদের

দ্বারা আজীবন নিপীড়িত ভারতচন্দ্র এ-সত্য তাঁর সমগ্র অন্তরাত্মা দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন। নতুবা এত বুদ্ধিপ্রখর, কৌশলী কবি হয়েও ভারতচন্দ্র, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে একজন স্বাধীনচেতা, পরাক্রমশালী স্বজাতীয় স্বদেশী রাজাকে পর্যুদস্ত করার জন্য নিন্দনীয় উপায়ে মর্যাদামানকর হীনপন্থার আশ্রয়ী নীচাশয় ব্যক্তিরূপে সামন্ত রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমনের উদ্দেশ্য দিল্লী থেকে আগত মোগল সেনাপতি মানসিংহকে অভ্যর্থনার জন্য সোপচৌকন, হুগলী থেকে বর্ধমানে কানুনগো ভবানন্দের উপস্থিতি এবং সর্বক্ষণ পরিচর্যায় রত থেকে বাংলাদেশের যাবতীয় খবরাখবর মানসিংহকে জানিয়ে প্রিয় হবার প্রয়াস ; স্বগ্রাম বাগোয়ানে মানসিংহের সংবর্ধনা, ঝড়-বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত প্রায় মানসিংহ ও তার সৈন্য-সামন্তকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়ে সতেজ করে তোলা এবং বিনিময়ে ভবানন্দকে মানসিংহের পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি ; গুপ্তপথ প্রদর্শকরূপে যশোর পর্যন্ত মানসিংহের অনুগমন এবং পথিমধ্যে প্রতাপাদিত্যের শক্তি-সামর্থ্য-সম্পর্কিত গোপন তথ্য মানসিংহকে জ্ঞাত করা ; যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে পর্যুদস্ত, পিঞ্জরাবদ্ধ প্রতাপাদিত্যসহ মানসিংহকে নিয়ে স্বগ্রাম নিজ বাটীতে প্রত্যাবর্তন এবং পারিতোষিকের লোভে মানসিংহের সঙ্গে দিল্লীযাত্রার মত ইত্যাদি ঘটনার[৩৫] কার্যকারণসম্বন্ধ এবং দিল্লীর পথে স্বজাতীয় বন্দী-বীরের মৃতদেহ ঘৃতে ভেজে বাদশাহর সমীপে উপস্থিত করার মত নির্মম দৃশ্যের নির্বিকার দর্শকরূপে[৩৬] রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রের আদি রাজ-পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার তথা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবংশের জন্য নিশ্চয়ই খুব গৌরব-জনক পরিচয় বহন করে না। অতি সর্তক পরিকল্পনায় দু'টি নির্দিষ্ট বস্তুনিষ্ঠ মূল্যমানের লক্ষ্যে যথার্থ উপ-যুক্ততায় ভারতচন্দ্র ভবানন্দের চরিত্র নির্মাণ করেছেন বলে ধারণা হয়।

এক. মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যানের কাহিনী সপ্তদশ শতকের প্রথম দু'দশকের পটভূমিতে স্থাপিত হলেও, সমকালের প্রবল বিসদৃশ পরিবেশের অভিজ্ঞতা ও যুগযন্ত্রণা ছিল ভারতচন্দ্রের কবিভাবনার মৌলিক উপাদান। ভারতচন্দ্র তার সমকালের নারকীয় দুরবস্থা তথা যুগযন্ত্রণা, বিশেষ করে বাংলাদেশের বিপন্ন স্বাধীনতা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন,[৩৭] এমন অভিযোগ সত্য নয়। বরং যুগযন্ত্রণার তীব্র দহনেই ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা ত্বরিত গতিময়তায় তীর্যক হয়ে উঠেছে।

তাঁর অন্নদাপ্রশস্তির কাহিনী বিক্ষিপ্ত ও অসম্বদ্ধভাবে অগ্রসর হয়েছে। যুগটা তখন দেবপ্রশস্তির ছিলোনা; সমাজজীবনে তার গুরুত্বও বড় একটা ছিলোনা। অতি দ্রুত ঘটিত ও ঘটমান বিপরিনামী বিপর্যয়ে সংশয়াকুল, তটস্থ সমাজজীবন তখন দ্রুত প্রবাহিত, বিক্ষিপ্ত। তাই অন্নদাপ্রশস্তিতে সুযোগ পেলেই যুগের বিষযন্ত্রণায় নীলকণ্ঠ, পরচ্ছন্দানুবর্তী কবি ভারতচন্দ্রের কবিদৃষ্টি প্রসঙ্গে-অপ্রসঙ্গে সহসাই ব্যঙ্গে-বিদ্রুপে-শ্লেষে, কখনো বা অশ্লীল উক্তিতে হীরার ধারের মতোই উদ্যত ও তীর্যক হয়ে উঠেছে। ব্যঙ্গ-শ্লেষ-অশ্লীল উক্তি ভারতচন্দ্রের সময়ের তথা তাঁর কাব্যের অলঙ্কারস্বরূপ। এ প্রসঙ্গে সমকালের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক-ধর্মনীতিক ও নৈতিক জীবনের চরম অব্যবস্থা-দুরবস্থা, দুর্গতি-অধোগতির প্রতি ভারতচন্দ্রের বিবিধ বিক্ষিপ্ত উক্তি স্মর্তব্য। ইতঃপূর্বে কিয়ৎপরিমাণে তা আভাষিত হয়েছে। তবে, সম্ভবত বাংলাদেশের বিপন্ন স্বাধীনতাই ছিল ভারতচন্দ্রের তীব্রতম যাতনাদায়ক অনুভব। দিল্লীতে উৎপাত প্রসঙ্গের একটি প্রবেশক সংগীতে বিক্ষিপ্ত পরোক্ষ উক্তিতে ভারতচন্দ্রের এই মানসিক যন্ত্রণার স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষযোগ্য:

এ কি ভূতাগত দেশেরে।
না জানি কি হবে শেষেরে॥
উত্তম অধম না হয় নিয়ম
কেহ নাহি ধর্ম লেশেরে।
... ...
যবনে ব্রাহ্মণে সমভাবে গণে
তুল্যমূল্য গজ-মেষেরে।
ভারতের মন দেখি উচাটন
না দেখি হৃষীকেশেরে॥[৩৮]

উক্তিটির বাচ্যার্থের সঙ্গে প্রসঙ্গ কথার অসঙ্গতি প্রনিধানযোগ্য। উক্তিটির দেশ—বাংলাদেশ, সময়—অষ্টাদশ শতক, ভূত—ইংরেজ। দেশের চরম বিপর্যয়কালে তাদের অসাধুতৎপরতায় উত্তম-অধম, ধর্মাধর্ম, হিন্দু-মুসলমানে কোন পার্থক্য ছিলোনা, নীতির বালাই ছিলোনা। তাদের অশুভ তৎপরতায় ভারতচন্দ্র তো অবশ্যই, অকল্যাণ-আশঙ্কায় সমগ্র উপমহাদেশ

ছিলো আতঙ্কিত। কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিত কবি ভারতচন্দ্রের একমাত্র হৃষীকেশের সাহায্যকামনা ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর ছিলোনা। এর বেশী স্পষ্ট হওয়া ভারতচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে তাঁর এ বিপর্যস্ত মানসিক অনুভবের সার্থকতম প্রকাশ ঘটেছে প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে। বাংলার বিপন্ন স্বাধীনতার উজ্জ্বলতম প্রতীক, স্বাধীনতার গৌরবে দীপ্ত, বীরত্বে, ত্যাগে, মহিমায় মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যানের পুরুষোত্তম চরিত্র প্রতাপাদিত্য,—বাংলার দুর্গত স্বাধীনতার জন্য উৎকন্ঠিত-চিত্ত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মানসমূর্তি। ভারতচন্দ্রের যন্ত্রণাকাতর অনুভবের দ্রুততম কাব্যরূপ, ভবানন্দ-মানসিংহ কাব্যের একমাত্র উজ্জ্বলতম লক্ষ্য প্রতাপাদিত্য চরিত্র। ভারতচন্দ্র অতি সংক্ষেপে তাঁর সমস্ত আনন্দ-বেদনা দিয়ে এ চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন।

রাজসভার কবি হিসেবে ভারতচন্দ্র মুর্শিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়ালদের সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের গোপন দহরম-মহরম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত ছিলেন। দূরাগত-দূরাচারী বণিকদের সঙ্গে বাংলার স্বাধীন নবাব তথা বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কৃষ্ণচন্দ্রের চক্রান্ত,[৩৯] স্বাধীনতার গৌরব ও মর্যাদাসচেতন ভারতচন্দ্র রায় সহজ দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে পারেননি। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এ গোপন ষড়যন্ত্রই ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের ওপর ভারতচন্দ্রের অসন্তুষ্টি তীব্র হওয়ার সাক্ষাৎ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এবং এ ঘৃণিত তৎপরতার প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ চিত্তের কৌশলী মননে ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিরূপে ভবানন্দ মজুমদারের অনুরূপ চরিত্র পরিকল্পনা করেছেন বলে মনে হয়। এ-ছাড়া নিরূপায় ভারতচন্দ্রের কোন দ্বিতীয় বিকল্প ছিল না। আশ্রিত কবি হিসেবে দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে চরম সর্বনাশা ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ তিনি সরাসরি করতে পারেননি, তাই তিনি করেছেন স্বাধীনচেতা স্বজাতীয় সামন্ত রাজা, বীরযোদ্ধা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে ভবানন্দ মজুমদারকে অতি নীচ প্রকৃতির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতকী কলঙ্কে মসীকৃষ্ণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভবানন্দ মজুমদার বাল্যকাল থেকেই যশোর রাজ-পরিবারের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন।[৪০] সঙ্গতভাবেই ধারণা করা যায়, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি ভারতচন্দ্রের ঘৃণা সম্ভবত আরো কঠিন ছিল। দিল্লী যাওয়ার পথে বন্দী প্রতাপাদিত্যের মৃত দেহ ঘৃতে ভেজে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত করার মত নির্মম, অনৈতিহাসিক এবং দেবপ্রশস্তির সঙ্গে সম্পর্করহিত ঘটনার বর্ণনা, আপাতদৃষ্টিতে মোগল সেনাপতি মানসিংহ তথা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের জন্য প্রতীয়মান হলেও, স্বাধীনতা প্রিয়, স্বজাতীয় বাঙালী বীরের এরূপ আমানুষিক পরিণতির নির্বিকার সহকারী রূপে অপর স্বার্থপরায়ণ বাঙালী ভবানন্দ মজুমদারের পাশবিক হৃদয়হানতার তুলনায় মানসংহ-জাহাঙ্গীরের নিষ্ঠুরতা যে অতি তুচ্ছ হয়ে যায়,--এ অনুভব সপারিষদ মদ্যপ কৃষ্ণচন্দ্রের না হলেও, ভারতচন্দ্র গৃধ্নু, নীচাশয় ভবানন্দের সীমাহীন নৃশংসতা বোঝাতেই সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এমন একটি অবান্তর ঘটনার অবতারণা করেছেন। ভারতচন্দ্রের প্রতিভা ছিল, বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল ছিল, ইতিহাসসঙ্গত দৃষ্টি ছিল।[৪১] ভারতচন্দ্র অনায়াসেই ভবানন্দের চরিত্র মানবীয় মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলতে পারতেন। প্রতাপাদিত্য চরিত্রই তার প্রমাণ। ভারতচন্দ্র তাঁর ত্বরিত কৌশলে হরিহোড়, ঈশ্বরী পাটুনীর চরিত্র যে ভাবে মানবীয় মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন, মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যানের দীর্ঘ ইতিবৃত্তে ইচ্ছাকৃত-ভাবেই ভারতচন্দ্র ভবানন্দ-চরিত্রের জন্য সে আয়াস গ্রহণ করেননি। কারণ, তা হলে দেবভক্ত ভবানন্দ মজুমদার তথা কৃষ্ণচন্দ্রের মত সমকালের সামন্ত প্রভুদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ভারতচন্দ্রের উদ্দেশ্য সফল হতো না।

দুই. ভবানন্দ মজুমদারের ব্যক্তিত্বহীন নিষ্ক্রিয় চরিত্ররূপ পরি-কল্পনায় ভারতচন্দ্র জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর বাস্তব-ধর্মী, দৃষ্টি-ক্ষম চিন্তা-চেতনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, ইতঃপূর্বের আলোচনায় তা সম্যক অবধারিত হয়েছে। মধ্যযুগের প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কেও ভারতচন্দ্রের চিন্তা-চেতনা এ-বাস্তবজ্ঞান দ্বারা প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছে। বস্তুত, মধ্যযুগের দেব-দেবী প্রভাবিত ধর্ম-কর্ম, সমাজজীবনব্যবস্থায় ভারতচন্দ্রের আদৌ কোন বিশ্বাস ছিল না---সে সম্পর্কেও ইঃতপূর্বে সপ্রমাণ আভাষিত হয়েছে। একদিকে সম-কালের চরম অব্যবস্থার সুযোগে ধর্মধ্বজী সামন্ত সমাজপতি, রাজা-ভূস্বামীর সীমাহীন যথেচ্ছারের অব্যাহত পীড়নে পর্যুদস্ত সমাজ

ও জন-জীবনের অন্তহীন দুর্দশা, অপর দিকে, অসার দেব-মাহাত্ম্য ও দেবানুগ্রহ-রূপ মঙ্গল-গানের নামে ও প্রভাবে সাধারণ মানুষকে জীবনের কঠিন বাস্তব-জীবনের চেতনা থেকে বঞ্চিত করে অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত রাখার প্রয়াস,--জীবনধর্মী, সূক্ষ্মদর্শী ভারতচন্দ্রের কাছে একান্তই গর্হিত, বেদনাদায়ক ও অমানবিক মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ভারতচন্দ্র তাঁর দৃষ্টিক্ষম বাস্তব অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন, দেবমাহাত্ম্যের মঙ্গল-গান আসলে সমাজের একশ্রেণীর অভিজাত কুলীন উচ্চবিত্তের স্বার্থসিদ্ধি তথা শাসন-শোষণ, প্রভাব-প্রতিপত্তির একটা অতি সহজ উপায়মাত্র। মধ্যযুগের শুরুতে উচ্চ-নীচ বিভিন্ন বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সমঝোতা ও ঐক্যপ্রতিষ্ঠার কৌশল হিসেবে তার প্রয়োজন ও গুরুত্ব অবশ্যই অর্থবহ ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের দুর্বিষহ আপৎকালে একশ্রেণীর ধর্মহীন, সুবিধাবাদী উদীয়মান ধনিক-বণিক ও সামন্ত ভূস্বামীর অসৎ ও হীন স্বার্থ-সিদ্ধির কায়েমী ব্যবস্থা হিসেবে অভিনব প্রতিরূপে নতুন করে সমাজজীবনে দেবপ্রশস্তি প্রচারের প্রয়াস ভারতচন্দ্রের সুদৃঢ় কবি-ব্যক্তিত্বে খুবই অসঙ্গত ও মানবতা-বিরোধী অভিসন্ধি বলে মনে হয়েছে। তবু দেবপ্রশস্তি রচনার জন্য আদিষ্ট নিরূপায় ভারতচন্দ্র এ-ক্ষেত্রেও একই ব্যাজস্তুতির কৌশলে অন্নদার একান্ত বশংবদ ভক্ত সেবকের ব্যাজে ভবানন্দকে নিষ্ক্রিয়, নিষ্প্রাণ, অসাড়, সত্তাহীন ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত করে প্রকারান্তরে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এরূপ অসার দেবধর্মের ভক্ত অনুসারী মাত্রই ভিজে বেড়াল জাতীয় সুযোগসন্ধানী, মনুষ্যত্বহীন, অলস, অকর্মণ্য ও লোভী এবং দেবপ্রশস্তিই হচ্ছে তাদের রক্ষাকবচ। সুযোগমত ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়ে নীরবে অল্পায়াসে স্বার্থ-সিদ্ধিই এদের স্বাভাবিক পরিচয় এবং এরূপ দেব-ধর্মানুসারী ভক্ত ন্যায়ান্যায়বোধ-রহিত নির্দয় মানব সমাজের কল্যাণ বিরোধী, মনুষ্যত্বহীন পাষণ্ড-স্বরূপ মনুষ্যেতর প্রাণী। এ ভাবে ভারতচন্দ্র ব্যাজস্তুতির কৌশলে এক ভবানন্দ চরিত্রের মাধ্যমে একই সঙ্গে সমকালের দু'টি অতি গুরুত্বপূর্ণ যুগযন্ত্রণা—দেব-মাহাত্ম্যের অসারত্ব এবং ধর্মধ্বজী সমাজপতি সামন্ত প্রভুদের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে। অতএব ভবানন্দের চরিত্র নির্মাণে ভারতচন্দ্র অমনোযোগী ছিলেন কিম্বা ব্যর্থ হয়েছেন,--এর কোনটাই সত্য নয়। বরং অতি সতর্কতার সঙ্গেই তিনি ভবানন্দের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

আট

সঙ্গত কারণেই ভারতচন্দ্রের ধর্মবোধ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং আধুনিক সমালোচক তার ধর্মবোধ সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেননি।[৪২] কিন্তু একটু মনোযোগের সঙ্গে বিচার করলে ভারতচন্দ্রের ধর্মদৃষ্টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া খুব কঠিন নয়। যে অন্নদা-মঙ্গলের মতামত দৃষ্টে তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, সেই অন্নদা-মঙ্গলেই তার নিঃসংশয় জবাব আছে। আধুনিক সমালোচক অন্নদা-মঙ্গলের আখ্যানাংশের দেব-মাহাত্ম্যে তথা প্রচলিত ধর্মাচারের প্রতি ভারতচন্দ্রের নেতিবাচক বিসদৃশ মনোভাবের দৃষ্টান্তে তার ধর্ম-বোধ প্রতিপাদনে প্রবেশক সঙ্গীতগুলোর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ, একমাত্র প্রবেশক সংগীতগুলোতেই ভারতচন্দ্রের দেব-বন্দনা স্বতঃস্ফূর্ততায় আন্তরিক। কিন্তু প্রবেশক সঙ্গীতেও দেবতা-উপ-দেবতার প্রতি ভারতচন্দ্রের সম-আন্তরিকতা দর্শনে কোন বিশেষ ধর্ম-দেবতার প্রতি তাঁর ভক্তি-বিশ্বাস নিরূপণে আধুনিক সমালোচক ব্যর্থ হয়েছেন। আসলে তাঁর ধর্মচেতনা প্রবেশক সঙ্গীতের দেব-বন্দনার আন্তরিকতায় অবধার্য নয়। প্রবেশক সঙ্গীতে তাঁর আন্তরিকতা দেবতার প্রতি তাঁর বিশ্বাস-ভক্তিহেতু নয়। এ-আন্তরিকতা তাঁর কবিআত্মার স্বভাবজ গীতিময়তায় স্বতঃস্ফূর্ত এবং মঙ্গল-কাব্যের প্রথাবদ্ধতায় তাঁর গীতি-প্রবণ কবি-স্বরূপের স্বতঃস্ফূর্ত এবং সান্দ্র আনন্দ-সংযোগ, —কোন দেব-বিশ্বাসের সঙ্গে নয়। আসলে কোন দেবতার প্রতিই তাঁর বিশেষ কোন অনুরাগ ছিল না বলেই গীতিময়তার স্বাভাবিক আন্তরিক-তার স্পর্শে ছোট-বড় সকল দেবতা উপ-দেবতাই, সমভাবে বন্দিত হয়েছে।

কিন্তু ভারতচন্দ্র ধর্মহীন কিম্বা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। ভারত-চন্দ্রের ধর্মবোধ তাঁর কবিসত্তার গভীরে নিহিত এবং তাঁর কাব্য-সাধনার বিবিধ কৌশলে প্রকাশিত। ভারতচন্দ্রের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রথম রচনা 'সত্যপীরের কথা'। বলাবাহুল্য, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সত্য-পীরের পাঁচালী বিরুদ্ধ ধর্ম-জাতির সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও অনুশীলিত। পাঠ্যাবস্থায়, কিশোর-উত্তীর্ণ বয়সের প্রথম রচনা হিসেবে এরূপ একটি কাব্যের নির্বাচন নিঃসন্দেহেই ভারতচন্দ্রের মানবিক-মানসিক সংগঠনের পরিচয় বহন করে। পরিণত বয়সের

রচনা অন্নদামঙ্গলে দেব-মাহাত্ম্যের বিবিধ অনুষঙ্গে তাঁর ধর্মানুভূতির মানবিক সিদ্ধান্ত সবিশেষ লক্ষযোগ্য।

মর্ত্যলোকে কাশীতে অন্নদার অধিষ্ঠান প্রসঙ্গে প্রায় অনাবশ্যক ঘটনার মত শিবপূজার অসারত্ব নিয়ে মর্ত্য-মানব বেদ-ব্যাসের যুক্তি-বিতর্ক এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের তুলনামূলক মাহাত্ম্য বিচার করে ব্রহ্মার একত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং শিষ্যদের প্রতি ব্যাসের বাণী :

'অন্য অন্য ফল পাবে ভক্তি অন্য জনে।
মোক্ষ ফল পাবে যদি ভজ নারায়ণে॥
নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপে সাকার।
সত্ত্বরজোস্তমোগুণ প্রকৃতি তাহার॥[৪৩]

অথবা—

বিধাতা সবার বড় তাঁহার করিব দড়
যাহা হৈতে সকলের সৃষ্টি।'[৪৪]

এ-উদ্ধৃতি ভেদ-বুদ্ধিরহিত মোহমুক্ত ভারতচন্দ্রের ধর্মচেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে অবশ্যই মনোনিবেশযোগ্য। 'যাহা হইতে সকলের সৃষ্টি'-সেই নিরাকার ব্রহ্মায় ভারতচন্দ্রের বিশ্বাস আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে দিল্লীতে একে অপরের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর-ভবানন্দের নিন্দামূলক বিতর্কে। দুটি পৃথক কবিতায় দুটি ধর্মেরই নিন্দাবাদ প্রচার করা হয়েছে। কবিতা দুটিতে উপস্থিত কালের দুটি বৃহৎ পৃথক ধর্ম-জাতির ভ্রমাত্মক ধর্মদ্বেষিতা নিরসনের লক্ষ্য ভারতচন্দ্রের মনোভাব ও প্রয়াস লক্ষযোগ্য। উভয় কবিতাতেই এক ধর্মের বিরুদ্ধে অপর ধর্মের নিন্দাবাদ আছে কিন্তু কোন বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাসকে ছোট কিম্বা বড় করার প্রয়াস নেই। বরং উভয় ধর্মের নিন্দা বা প্রশংসার ভারসাম্য বজায় রেখে ধর্ম-বিষয়ে ভারতচন্দ্র ঈশ্বরের একত্বে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের হিন্দুধর্ম নিন্দার জবাবে ভবানন্দের উক্তি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য :

হিন্দু-মুসলমান আদি জীব-জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত॥[৪৫]

উদ্ধৃতিটির মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের মনোভাব অতি স্পষ্ট। মানবত্বের মহিমায় অনুপ্রাণিত ভারতচন্দ্রের মুক্ত কবিসত্তায় ঈশ্বরের

নিরাকৃতি একত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় ছিল না। তার প্রমাণ নিম্নের চরণ ক'টিতে সুস্পষ্ট :

এ ফের বুঝিবে কেবা।
তারে বুঝে সুঝে যেবা ॥
নিত্য নিরঞ্জন সত্যি সনাতন
মিথ্যা যত দেবী-দেবা।
নিরূপ যে ভাবে স্বরূপ প্রভাবে
বুঝি কিছু বুঝে সেবা॥
ঈশ্বরের নামে তরি পরিণামে
কেবা গয়া গঙ্গা রেবা।
ভারত ভূতলে যে করে যে বলে
সব ঈশ্বরের সেবা॥[৪৬]

পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি অন্নদার মাহাত্ম্যকীর্তন প্রসঙ্গে এবম্প্রকার উক্তি ভারতচন্দ্রের ধর্মচেতনা বিচারে অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অতঃপর ভারতচন্দ্রের ধর্মবোধ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণের কোন যুক্তি নেই। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের মানবসত্যে অনুপ্রাণিত, সমকালের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রীয়-ধর্মীয় আবর্তে বিভ্রান্ত মানবতার মুক্তি অনুধ্যায়ী ভারতচন্দ্র ধর্মবোধে ছিলেন নিরাকার ব্রহ্মা তথা ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী।

নয়

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ভারতচন্দ্র ছিলেন মধ্যযুগের অন্তিম লগ্নের এক নিদারুণ উত্তাল বিপর্যয়কালের প্রথা-পদ্ধতিতে মোহাচ্ছন্ন, শাস্ত্রাচার সর্বস্ব সমাজ-কারাগারে আবদ্ধ এবং বিকৃতরুচির একশ্রেণীর দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, স্বৈরাচারী উচ্চাভিলাষী ভূস্বামীর ইচ্ছানুবর্তিতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর-বেষ্টিত এক বিপন্ন কবিপ্রতিভা। তবু, এহেন জাড্য, অসার দেবধর্ম অনুশাসিত এবং ধর্ম-ধ্বজী, অধঃপতিত সামন্ত-ভূস্বামী সমাজ-পতিপ্রভাবিত ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা থেকে ব্যক্তিসত্তায় জাগ্রত, মানবাত্মার মুক্তি প্রয়াসী ভারতচন্দ্রের সাহসিক কবিব্যক্তিত্বের পরিচয় বিক্ষিপ্তভাবে অন্নদা-মঙ্গল কাব্যের প্রায় সর্বত্রই নিরীক্ষণীয়। অন্নদা-

মঙ্গলে অবশ্যই দেব-মাহাত্ম্যের প্রয়াস আছে। বর্তমান আলোচনায় ইতঃপূর্বে লক্ষিত হয়েছে, সে মাহাত্ম্যপ্রয়াস ভারতচন্দ্রের ভক্তি-বিশ্বাসের অভাবে কী ভাবে দেব-কথায় পরিণত হয়েছে। লক্ষিত হয়েছে সে দেব-কথায় ভক্তি বিনা অন্নদার অস্তি-চর্মসার কঙ্কালবৎ অসার মূর্তিটি ভারতচন্দ্রের ভাষামাহাত্ম্যের কাছে (তুলনায়) কত করুণ ও অসহায়! বাচনভঙ্গির মোহনীয় চমৎকারিত্বে, শব্দচ্ছটার রকমারি প্রাচুর্য ও তড়িৎচমক এবং ছন্দবৈচিত্র্যের শ্রুতিমোহন মাধুর্যের অব্যাহত আনন্দপ্রবাহে যখনই সুযোগ হয়েছে, অথবা সুযোগ ব্যতিরেকে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক কথনরূপে কৃষ্ণচন্দ্রের উচ্চাভিলাষী অভিপ্রায় ও দেব-মাহাত্ম্য উপেক্ষা করে ভারতচন্দ্রের বাস্তব চেতনাসমৃদ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ সত্তাযুক্ত কবিদৃষ্টির মানবিক মূল্যবোধ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ-চন্দ্রের আদেশে রচিত অন্নদা-মঙ্গল অবশ্যই 'নতুন মঙ্গল'[৪৭] তবে সে নতুন মঙ্গল কৃষ্ণচন্দ্রের অভিপ্রেত 'নতুন মঙ্গল' নয়,—ভারতচন্দ্রের নতুন কবিদৃষ্টির আলোকে, সরস ভাষণে, মানবত্ব ও শিল্পবৈচিত্র্যের 'নতুন মঙ্গল'। অর্থাৎ, অতঃপর কাব্যচর্চার বিষয় দেবতা নয়,—সরস ভাষণে মানুষ তথা মানব-সত্যের শিল্পরূপ। আর এ-প্রেরণায় উদ্দীপ্ত ভারতচন্দ্রের কাব্যসাধনায় কোনরূপ সাম্প্রদায়িক, বর্ণ বা ধর্মগত ভেদ-বুদ্ধি ছিল না। বরং স্রষ্টার একত্বে, একক 'মানব-সত্যে' ঐক্যের মহান প্রয়াস ছিল। এ ভাবেই সমগ্র অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ভারতচন্দ্রের নিঃসঙ্গ কবিআত্মার কৌশলী প্রয়াসে এক অভিনব মহান মানবত্বের লক্ষ্যে বাংলা কাব্যের মুক্তি অন্বেষিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা ছিল নতুন যুগের উদ্দীপনায় প্রমত্ত এক বিদ্রোহী সত্তা। ভারত-প্রতিভা যুগসৃষ্ট ও যুগস্রষ্টা—উভয়ই। তাঁর কবিব্যক্তিত্ব ও জীবনযন্ত্রণা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গেই তুলনীয়! আধুনিক সমালোচক ভারত চন্দ্রকে যথার্থই 'মানব-ধর্মী মোহ-মুক্ত আধুনিক মহাকবি'[৪৮] বলে অভিহিত করেছেন।

মধ্যযুগের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-পদ্ধতি, ধ্যান-ধারণার আবদ্ধতা থেকে ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মুক্তি, স্বাধীনতার মর্যাদা, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বাস্তব মূল্যবোধ ও যুক্তি-বিচারের মানবীয় মহত্ত্বে আত্মার জাগরণ এবং তদ্ভাবজ সৃজনশীল কাব্য-

কলা-চিত্রাদির শিল্পিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যপূর্ণ নির্মাণশৈলী ইউরোপের রেনেসাঁসীয় জাগৃতির অন্যতম প্রধান গুণ-বৈশিষ্ট্য বা অবদান হলে, মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ছিলেন বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সেই মহান রেনেসাঁসীয় প্রতিভার অধিকারী প্রথম জ্যোতিষ্মান কবিব্যক্তিত্ব। প্রসঙ্গত ইতঃপূর্বের উল্লেখ স্মর্তব্য, ইউরোপীয় রেনেসাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতচন্দ্রের কোন পরিচয় বা যোগসূত্র ছিল না। ভারতচন্দ্রের কবিআত্মার এ মহান জাগরণ, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের মানবধর্মিতার আদর্শে আশৈশব লালিত, ঋদ্ধ ও অনুপ্রাণিত ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিক্ষম কবিব্যক্তিত্বের অনুধ্যানে স্বতঃস্ফূর্ত।

আধুনিক সমালোচকের অভিমত, ভারতচন্দ্রের প্রতিভার অভিনব কাব্যদৃষ্টি নিয়ে কোন যুগ সৃষ্টি হয়নি।[৪৯] বর্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়েছে, এ অভিযোগ সত্য নয়, বরং আধুনিকতায় বাংলা কাব্যের উত্তরণ ভারতচন্দ্রের পরিদৃষ্ট কাব্যাদর্শেরই বিবর্তিত সংবেদ। তবে উক্ত অভিমতের আংশিক সত্যই ভারতচন্দ্রের জন্য দুর্ভাগ্যজনক হয়েছে, এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্য এক ক্লিন্ন ও ক্লিষ্ট যুগের সূচনা করেছে। দুর্ভাগ্য ভারতচন্দ্রের যে, একটা মহা সম্ভাবনার উপক্রমিক দ্রষ্টা হয়েও তিনি যুগস্রষ্টার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, দুর্ভাগ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্য তথা বাঙালী জাতির যে, তাঁর মোহমুক্ত মানবধর্মী কাব্যাদর্শ, আধুনিক যুগে বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এ জন্য দায়ী ভারতচন্দ্র কিম্বা ভারতচন্দ্রের কাব্যদৃষ্টি নয়, সমাজের একশ্রেণীর উচ্চাভিলাষী উচ্চবিত্ত কুলীনের অভিলষিত ও আমন্ত্রিত পরাধীনতা।[৫০]

তথ্যনির্দেশ

১ শ্রী মদনমোহন গোস্বামী, ভারতচন্দ্র, সঙ্কলিত, সাহিত্য অকাদেমী নিউ দিল্লী, ১৯৬১, পৃ. ৮

২ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী, ঐ, পৃ. ৫]

৩ আবদুল মাজেদ খান, The Transition in Bangal, Cambridge University Press1, 969, Pp-101-2.

৪ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী, ঐ পৃ. ১৪

৫ বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, সংযোজন-১৯৭০, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা-১৯৭৯, পৃ. ১৪৪

৬ Encyclopaedea Britanica, Vol. 6, First published in 1768, by a society of Gentlemen in Scotland, Encyclopaedea Britanica, INC. William Benton publishers, Chicago-London etc. p. 834

৭ শিবনারায়ণ রায়, কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা--১, ১৯৭৩, পৃ. ৪২-৪৩

৮ Ecyclopaedea Britanica. IBID. p. 828

৯ শিবনারায়ণ রায়, ঐ, পৃ. ৪৩-৪৪

১০ Encyclopaedea Britanica, Vol-19, IBID. pp. 123-24

১১ The New Encyclopaedea Britanica, Macropaedea Vol. 15, Renaissance, p. 660

১২ Britain And Her Neighbours, Book V. The new Liberty—1485-1688, Blacki and sons limited, 50 old Bailey, London E. C. Clasgo and Bombay, pp. 14-17

১৩ The new Encyclopaedea Britanica, IBID, Michelet Jules; Quoted, pp. 660-61

১৪ শিবনারায়ণ রায়, ঐ, পৃ. ৪৯-৫৪

১৫ বিনয় ঘোষ, ঐ, পৃ. ১৫৮-৭৭

১৬ বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড-১৮৪০-১৯০৫, বেঙ্গল পাবলিসার্স লিমিটেড, কলিকাতা-১২ প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৬২, পৃ. ৩৩৫-৩৩৭

১৭ বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, ঐ, পৃ. ১৭৭

১৮ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৬ই জুলাই, ১৯৭০-দ্রষ্টব্য

১৯ The New Encyclopaedea Britanica, IBID, p. 660

২০ বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, (৩ খণ্ড একত্রে) জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃ. ৩৯৪-৯৮

২১ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী, ঐ, পৃ. ১৪

২২ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭০, পৃ. ৮৭৬-৯১১

২৩ শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, অন্নদা-মঙ্গল, তৃতীয় সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৬৯, ভূমিকা পৃ. ২৩

২৪ ঐ পৃ. ৫১-৫৪

২৫ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৮

২৬ শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৪-৬

২৭ The History of Bengal, Sir Jadunath Sarkar, The University of Dacca, Ramna, Dacca, First Edition, 1948, p. 454.

২৮ শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৫৬

২৯ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ঐ পৃ. ৭৬৮-৬৯

৩০ শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৫৪-৫৫

৩১ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, ঐ, পৃ. ৭-৮

৩২ শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ঐ, উদ্ধৃত, পৃ. ১৬

৩৩ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৮৭২

৩৪ ঐ, পৃ. ৮৯৬

৩৫ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, ঐ, পৃ. ১৯-৩৫

৩৬ ঐ, পৃ. ৪১

৩৭ শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৫৬

৩৮ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, ঐ, পৃ. ৫৮

৩৯ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৫৬

৪০ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান, সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৫

৪১ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৯১১

৪২ ঐ, পৃ. ৯২১-৯২৫

৪৩ অন্নদা-মঙ্গল, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ১১৪

৪৪ ঐ, পৃ. ১৩৭

৪৫ মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান, ঐ, পৃ. ৪৮

৪৬ ঐ, পৃ. ৪৫

৪৭ অন্নদা-মঙ্গল, ঐ, পৃ. ১২

৪৮ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী, ঐ, পৃ. ১৪

৪৯ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৮৮৫

৫০ কালীপ্রসন্ন সিংহ, উদ্ধৃত, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালা—১, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ৩য় সংস্করণ-১৩৫০, পৃ. ২৬